# ইসলাম

## অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

**অনুবাদ :** আলী আহমাদ মাবরুর

২

**(ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাস)**

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র


অধ্যায়-১

**ইসলামি বিশ্বাস : প্রথম পর্ব**

আল্লাহ কে ১৫

ফেরেশতা কারা ৪৮

জিন কারা ৫৮

আল্লাহর কিতাব ৬৯

নবি ও রাসূলগণ ৮৯

অধ্যায়-২

**ইসলামি বিশ্বাস : ২য় পর্ব**

আমাদের জীবন কে নিয়ন্ত্রণ করেন ১১৭

আমাদের মৃত্যুর পর কী হয় ১৩২

জান্নাত কী ১৫৬

জাহান্নাম কী ১৭০

# আল্লাহ কে

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—আল্লাহকে আমরা কীভাবে জানব।

## প্রাথমিক কিছু বিশ্বাস

গোটা মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—মানুষ বারবার নিজেদের জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ায় স্বাধীন করে প্রেরণ করেছেন। তারা ইচ্ছে করলে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে, সেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তায়। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য-সোজা পথে পরিচালিত করতেন।'[১]

কিন্তু প্রশ্ন হলো—আল্লাহ কে? তিনি কী? কীভাবে আমরা সেই সত্তাকে চিনতে পারব, যিনি সামান্য মৌখিক আদেশ দিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি তৈরি করতে পারেন? কেননা, কেবল আল্লাহরই এই ক্ষমতা রয়েছে। আল কুরআন বলছে—

> 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, সে সম্পর্কে কেবল হুকুম দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়।'[২]
>
> 'কোনো জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" এবং তা হয়ে যায়।'[৩]

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা নিয়ে সব সময়ই বিস্ময়ের ঘোরে আবদ্ধ ছিল। নানা সময়ে নানা জাতির ইতিহাসে দেখা যায়—মানুষ বিভিন্ন ধরনের ছবি ও মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গণ্য করেছে।

---

[১] সূরা নাহল : ৯
[২] সূরা বাকারা : ১১৭
[৩] সূরা নাহল : ৪০

আবার কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষ সৃষ্টিকর্তা বলতে অসংখ্য দেবতাকে বিবেচনা করেছে এবং একেকজন দেবতাকে একেক ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ভেবেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলেন—

> 'আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে, যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে? কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না। আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।'[৪]

মেক্সিকোতে ইতঃপূর্বে বসবাসকারী আজতেক জনগোষ্ঠী কুয়েতজেকোয়াতলের উপাসনা করত। গ্রিকদের ছিল ক্রোনাস, রোমানদের ছিল জুপিটার এবং চীনা জাতির কাছে উপাস্য হিসেবে ছিল ত্রি। শুধু তা-ই নয়, এ পৃথিবীতে যতগুলো সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তারা সকলেই নিজেদের মতো করে একজন সৃষ্টিকর্তা বা উপাস্যকে কল্পনা করে নিয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে সবচেয়ে পুরোনো যে বিশ্বাসের প্রতীকী নিদর্শন পাওয়া যায়, তা হলো মাতৃ-পৃথিবীর মূর্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে। তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।'[৫]

এসব ছোটোখাটো মূর্তির নিদর্শন আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ ও এশিয়া; সব সভ্যতাতেই পাওয়া যায়। সেই সময়ের মানুষ বিশ্বাস করত—পৃথিবীর উর্বরতা এবং মেয়েদের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে দেবতার নিদর্শন রয়েছে। আবার তারা এমন দেবতাকেও বিশ্বাস করত, যারা দাফন এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

## প্রথম মানবসম্প্রদায়

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি—আদম ও হাওয়া (আ.) ছিলেন প্রথম মানব-মানবী; যারা দেখতে আমাদের মতোই দৈহিক আকৃতির ছিলেন। প্রথম মানুষ হিসেবে তাঁরাই এ ধরণির বুকে হেঁটেছেন। তাঁরা একসময় জান্নাতে ছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় তাঁদের বাধ্য হয়ে দুনিয়ায় আসতে হয়। এই যুগল থেকেই পরবর্তী সময়ে অসংখ্য জাত-গোত্র ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মহান আল্লাহ এই সম্বন্ধে বলেন—

> 'শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরি করে নেয়।'[৬]

> 'প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। ( তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি,

---

[৪] সূরা নাহল : ৭৩-৭৪
[৫] সূরা নিসা : ১১৭
[৬] সূরা ইউনুস : ১৯

তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবি পাঠান। তাঁরা ছিলেন সত্য, সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তার মীমাংসা করা যায়। (এবং প্রথমে তাদের সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল, যাদের সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবল পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে। কাজেই যারা নবিদের ওপর ঈমান এনেছে, তাঁদের আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য-সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।'[৭]

খুব সম্ভবত মানুষে মানুষে এ বিভাজনগুলো তাদের ক্ষমতা, সম্পদ ও বিশ্বাসের ওপর ভর করেই রচিত হয়েছিল। আল্লাহ বহু আগেই আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নবি-রাসূল পাঠাবেন।

যদি তারা আল্লাহর প্রেরিত বার্তাসমূহ মেনে নেয় ও অনুসরণ করে, তাহলে তারা উন্নতি করবে। আর যদি তারা বিভাজিত ও বিভক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাহলে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আওতায় চলে যাবে। ফলত তাদের জন্য নির্ধারিত হবে শুধুই লোকসান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

'তখন আদম তাঁর রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল। রব তাঁর এই তওবা কবুল করে নিলেন। কারণ, তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।'[৮]

'তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে? নিঃসন্দেহে অপরাধী কোনোদিন সফলকাম হতে পারে না। এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করছে—তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে—"এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মাদ! ওদের বলে দাও— "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ, যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং জমিনেও না!" তারা যে শিরক করে—তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার ঊর্ধ্বে।'[৯]

---

[৭] সূরা বাকারা : ২১৩

[৮] সূরা বাকারা : ৩৭

[৯] সূরা ইউনুস : ১৭-১৮

# নবি ও রাসূলগণ

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—প্রথম যুগের নবিগণ যে কষ্ট করেছিলেন।

## পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন

অনেকের মনে একটি প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরপাক খায়—পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা এত বেশি কেন? বিশেষ করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা সিনেগগের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে। এ বিষয়ে ইসলামের একটি চমৎকার উত্তর রয়েছে।

কিছু মানুষ অবশ্য এগুলো নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে চায় না। তারা সরলভাবে বলে বসে—'সকল ধর্মই সত্য, সবগুলোর মূলকথা অভিন্ন।' আবার কিছু মানুষ আছে, যারা একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। তারা কোনো ধর্মকেই সঠিক মনে করে না। কোনো ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রেই তাদের আগ্রহ দেখা যায় না।

উপরিউক্ত দুই চিন্তাধারার লোকজনই ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। পরকালীন জীবনে উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথা ঠিক—পৃথিবীতে অনেক ধরনের ধর্ম রয়েছে। ধর্মগুলোর সূচনা হয়েছিল একই উৎস থেকে আর সেই উৎস হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

এরপর ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্মই বিলুপ্ত ও বিকৃত হয়ে গেছে। শুধু ইসলামই এখনও অবিকৃত অবস্থায় এর মৌলিকত্ব নিয়ে অবস্থান করছে। বাকি ধর্মগুলোর সত্যতা ও যথার্থতা নিয়ে কেউই নিশ্চিতভাবে স্বীকৃতি দেয় না, দিতে পারেও না।

ইসলামের ভাষ্যমতে, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সম্প্রদায়ের মাঝেই কিছু লোককে বাছাই করে নিয়েছেন—যারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সত্য পথের শিক্ষা দেন এবং ভালো কাজ করার আহ্বান জানান। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে। যখন কোনো উম্মতের কাছে তাদের রাসূল এসে যায়, তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফয়সালা করে দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।'[১০]

[১০] সূরা ইউনুস : ৪৭

কিন্তু বাছাইকৃত এই মানুষগুলোর ইন্তেকালের পর লোকজন আবার সেই শিক্ষা ভুলে যায় এবং ধর্মকে নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নেয়। তারা ওই বাছাইকৃত মানুষগুলোর পরামর্শ ও চিন্তাধারাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে।

তাই কয়েক প্রজন্ম পর এসে দেখা যায়—প্রকৃত শিক্ষার সাথে অন্য আরও অনেক কিছু মিলে এমন একটি দর্শন তৈরি হয়েছে, যা সত্য থেকে অনেক অনেক দূরে। আর এভাবেই মানুষের হাতে কৃত্রিমভাবে ধর্মের জন্ম হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন তাদের আমার আয়াত শোনানো হতো, তারা বলত—হ্যাঁ আমরা শুনেছি, আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও শোনাতে পারি। এ তো সেই সব পুরোনো কাহিনি, যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে।'[১১]

> 'তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও—যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে।'[১২]

হিন্দু ধর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখি—অনেক ধরনের পৌরাণিক গল্পগাথা, কিংবদন্তি, আধ্যাত্মিক দর্শন এবং অদ্ভুত সব ধর্মাচারের সমন্বয়। পৃথিবীতে কোনো নবি মানুষকে এমন শিক্ষা দিয়ে যাননি—একজন নারীকে জীবন্ত অবস্থায় তার মৃত স্বামীর সাথে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে।

কেউ বলে যাননি—গরুর মূত্র শরীরের জন্য উপকারী। বছরের পর বছর গোসল না করে লম্বা চুল বা নখ রেখে ভিক্ষা করার পক্ষেও কেউ সবক দিয়ে যাননি। অথচ হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই বিশ্বাসগুলোই লালন করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ কোনো বাহিরা, সায়েরা, আসিলা বা হাম নির্ধারণ করেননি, কিন্তু এ কাফিররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন (কারণ, তারা এ ধরনের কাল্পনিক বিষয় মেনে নিচ্ছে)। আর যখন তাদের বলা হয়—এসো সেই বিধানের দিকে, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং এসো রাসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়—"আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি, সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" তারা কি নিজেদের বাপ-দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানত না এবং সঠিক পথও তাদের জন্য ছিল না?'[১৩]

হিন্দু ধর্মে প্রকৃত ধর্মদর্শনের কিছু মৌলিক শিক্ষা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষাই বিকৃত ও বিবর্তিত হয়ে গেছে। অথচ অন্য সব এলাকার মতো প্রাচীন ভারতবর্ষেও নবি এসেছিলেন। কিন্তু হয় তাঁদের শিক্ষাগুলো স্থানীয় মানুষজন প্রত্যাখ্যান করেছে, নতুবা সামান্য কিছু সত্যের সাথে বাকি সব অদ্ভুত আচরণ ও কার্যক্রম যুক্ত হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

---

[১১] সূরা আনফাল : ৩১

[১২] সূরা আলে ইমরান : ১৩৭

[১৩] সূরা মায়েদা : ১০৩-১০৪

‘আর কে তার চেয়ে বড়ো জালিম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায়, যার সাজসরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরি করেছে? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি—যা তাদের কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদের সৎপথের দিকে যতই আহ্বান করো না কেন, তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।’[১৪]

আংশিক সত্য তথ্যগুলো ওজনদার মিথ্যার চাপে পড়ে অনেকটাই পিষ্ট হয়ে গেছে। আজকের সময়ের হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জীবনাচরণের মাঝে আদি ধর্মের প্রকৃত সত্য বা প্রকৃত শিক্ষা কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা এ কারণেই ইরশাদ করেছেন—

‘তোমাদের পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাতে তাঁরা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আগের রাসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে, তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।’[১৫]

‘যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে, তারা বধির ও বোবা। তারা অন্ধকারে ডুবে আছে। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন, আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন।’[১৬]

## সমাজজীবনের বিকাশ

মানুষের আদি ইতিহাসের শেকড় খুঁজতে গেলে হয়তো হাজার কিংবা লাখো বছর আগে যেতে হবে। আদম ও হাওয়া (আ.) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম দুজন মানুষ। আদম (আ.) আল্লাহ তায়ালার মনোনীত প্রথম নবিও বটে। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিজের সন্তান ও অন্য উত্তরাধিকারীদের দ্বীন সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি—আল্লাহর বন্দেগি করো এবং তাগুতের বন্দেগি পরিহার করো। এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও—যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে।’[১৭]

---

[১৪] সূরা কাহাফ : ৫৭
[১৫] সূরা আনআম : ৩৪
[১৬] সূরা আনআম : ৩৯
[১৭] সূরা নাহল : ৩৬

প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল খুবই সাদাসিধে ও সহজ-সরল। তারা একত্রে বসবাস করত। কিছু বছর পর তারা শিকার করতে শেখে। ধীরে ধীরে জন্ম হয় একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজকাঠামোর। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের জীবনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মানুষের মধ্য থেকে পথনির্দেশক হিসেবে নবি প্রেরণ করবেন; যারা তাদের সমসাময়িক প্রজন্ম ও উত্তরাধিকারীদের দ্বীন শিক্ষা দেবে। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন। কিন্তু শয়তান ছিল খুবই তৎপর। সে খোদার দেখানো পথ ও নীতি-নৈতিকতা থেকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে যেতে থাকল। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় কাছে এসে গেছে, অথচ সে গাফিলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে উপদেশ আসে, তা তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোনে এবং খেলার মধ্যে ডুবে থাকে, তাদের মন (অন্য চিন্তায়) আচ্ছন্ন। আর জালিমরা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে—‘এ ব্যক্তি মূলত তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কী, তাহলে কি তোমরা দেখেশুনে জাদুর ফাঁদে পড়বে?’[১৮]

একটা সময়ে মানুষ নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া, তর্ক আর সংঘাতে জড়িয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস ও মত পথ তৈরি করে নেয়। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একই কথা স্থিরীকৃত না হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে, তার মীমাংসা হয়ে যেত।’[১৯]

[১৮] সূরা আম্বিয়া : ১-৩
[১৯] সূরা ইউনুস : ১৯

# আমাদের জীবন কে নিয়ন্ত্রণ করেন

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—পার্থিব জীবনের ঘটনাগুলোর বিপরীতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব।

**কেন ঘটনাগুলো এভাবে ঘটে**

আমাদের পদক্ষেপগুলোর কার্যকারণ কী? আমরা কী করব, তা যদি আল্লাহ জেনেই থাকেন এবং তিনিই যদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে কাজের জন্য বান্দাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার কী প্রয়োজন? যদি আল্লাহ ভবিতব্য বিষয় জানেন, তাহলে কেন তিনি এই বিশ্বজগতের সূচনা ঘটালেন? আমার জীবন কি আসলে মুক্ত? এখানে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি?

মানুষ তার নিজের জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে চায়, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে চায়। কাউকে যখন বলা হয়—দুনিয়া পরীক্ষাকেন্দ্র, তখন সে পালটা জানতে চায়—এই পরীক্ষার নিয়ম কী? আল্লাহ নিজেই কি মানুষকে ভালো-মন্দ কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন? আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদেই এই সকল প্রশ্নের সহজ-সরল উত্তর প্রদান করেছেন।

তাহলে কেন আজকের সময়ের মুসলিমদের এ অনুভূতি হবে—তারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি—মুসলিমরা এ রকমটা মনে করার কারণ, তারা কুরআন ছাড়া অন্য সবকিছুই পড়ে। তা ছাড়া তারা এখন নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও মতামতকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ছাড়া অন্য সবকিছুকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে তারা একটি চক্রের মধ্যে পড়ে যায় এবং সেখানেই ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনো ধাঁধা বা প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না।

প্রথমেই অনুধাবন করতে হবে—আল্লাহ তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ গোটা বিশ্বজগৎকে একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি মানুষকে খুব সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কেবল একটি বিধানকে মেনে চলার বা অমান্য করার স্বাধীনতা ভোগ করে, এর বেশি কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব, যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।’[২০]

‘আমি এ আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিঃসন্দেহে সে বড়ো জালিম ও অজ্ঞ।’[২১]

এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়েই প্রশ্ন জাগে—নিজেদের জীবনের বিষয়ে আমাদের পছন্দ বা অপছন্দের পরিধি কতটুকু? আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ কেমন? এ ধরনের প্রশ্ন যেন মনে কোনো ধরনের সংশয় তৈরি না করে, সে কারণে ইসলাম শুরুতেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—কিছু না করে পুরস্কৃত হওয়ার বা ধ্বংস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বরং ইসলাম এমন একটি পথ বাতলে দেয়, যেন উভয় দিকই সঠিকভাবে সুরক্ষিত হয়। পার্থিব এ জীবনে মানুষের কিছু বিষয়ের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, আবার কিছু বিষয়ের ওপর একেবারেই নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে আমরা জীবন চলার পথে কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারি, আল্লাহ মূলত আমাদের সে পরীক্ষাই নিয়ে থাকেন।

## আমাদের স্বাধীনতার মাপকাঠি

আমরা জীবনের যে বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তা হলো—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, অনুভূতি, লক্ষ্য, আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণ। আমরা চাইলে অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারি আবার অবিশ্বাসও করতে পারি।

আমরা ভালো কাজ করতে পারি আবার মন্দ কিছুও করতে পারি। আমরা কারও ওপর রাগ করে তা লম্বা সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি আবার ভুলেও যেতে পারি। জীবনের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখে নিতে পারি আবার এগুলোকে অগ্রাহ্যও করতে পারি।

আবার পার্থিব জগতের অনেক কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। প্রকৃতির কোনো দৈব ঘটনা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ভূমিকম্প বা ঝড়- জলোচ্ছ্বাস আমরা ঠেকাতে পারি না। আপনি প্রত্যাশা করেন বা না করেন, এগুলো আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। অন্যরা যা ভাবে বা করে, তাতেও আপনি পরিবর্তন আনতে পারবেন না; এমনকি অন্য কারও কারণে আপনার জীবনও এতটাই পালটে যেতে পারে, যা হয়তো কখনো আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

---

[২০] সূরা মুহাম্মাদ : ৩১

[২১] সূরা আহজাব : ৭২

আপনাকে চাকরি দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারবেন না। আপনি কোনো দুর্ঘটনা ঠেকাতে পারবেন না। আপনাকে ভালোবাসতে বা ঘৃণা করতে কাউকে জোর করতে পারবেন না। কোন দেশে আপনি জন্ম নেবেন—তা নির্ধারণ করতে পারবেন না।

আপনার শারীরিক কাঠামো যেমনই হোক না কেন, আপনাকে তা মেনে নিতে হবে। অপছন্দ হলেই আপনি কোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারবেন না। এ রকম বহু কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আর বাহ্যিকভাবে যেসব ঘটনাবলি ঘটছে, তাও আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন, মাতৃগর্ভে কী লালিত হচ্ছে। কোনো প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তির জানা নেই—তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।'[২২]

অর্থাৎ আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে, সবকিছু আমাদের অধীনে নেই। আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কী প্রতিক্রিয়া দেখাব, তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ইসলাম এভাবেই জীবনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে। আল্লাহই একমাত্র সব জানেন, তিনিই সব দেখেন। রাসূল (সা.) বলেন—

> 'মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর, তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আর এই সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া কেউই লাভ করতে পারে না। দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হলে সে সবর করে, আর এটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। সুখ-শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে, আর এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।'[২৩]

## তাকদিরের ব্যাকরণ

ইসলাম আমাদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়। একটি হলো 'কাদা' আর অপরটি 'কদর'। একটি হলো দৃঢ় প্রত্যয় আর অন্যটি হলো নির্ধারিত মাত্রাজ্ঞান। আল্লাহ তায়ালা এ গোটা বিশ্বজগতের কার্যক্রমের ধরন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি কতটা সময় আপনি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন, তা সুনির্দিষ্ট করেছেন। আপনি ধনী হিসেবে থাকবেন নাকি দরিদ্র হিসেবে, কখন কোথায় মারা যাবেন— সবকিছুই নির্ধারণ করেছেন। এসব কোনো কিছুর ওপরই আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবি পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে, আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে, সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং

---

[২২] সূরা লোকমান : ৩৪

[২৩] মুসলিম

শোকরকারীদের আমি অবশ্যই প্রতিদান দেবো।'[২৪]

এই নির্ধারিত পরিসীমার ভেতর যেকোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর সব ধরনের স্বাধীনতাই আপনার রয়েছে। জন্মসূত্রেই আপনাকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিমত্তা, যৌক্তিকতা এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। এসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যকে আপনি আল্লাহর অনুসন্ধানে কাজে লাগাতে পারেন অথবা আপনার বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ ও ইন্দ্রিয়বোধকে অগ্রাহ্যও করতে পারেন। আপনার জীবন সেক্ষেত্রে বাজে সব অভ্যাস এবং অর্থহীন সুখে পূর্ণ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'যে আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র চায়, আমি তার কৃষিক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিই। আর যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায়, তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি; কিন্তু আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই।'[২৫]

'যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো, তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে, তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এরপর আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট।'[২৬]

সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। যদি কোনো ব্যক্তি অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী বা বোবা হয়ে জন্ম নেয়, তাহলে হয়তো তাকে দুনিয়াতে কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বিচার দিবসে পার পাওয়া তার জন্য হয়ে যাবে অপেক্ষাকৃত সহজ। মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে জন্ম নেওয়া কিংবা অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করা শিশুদের পরকালে কোনো জবাবদিহিতার ভেতর দিয়েই যেতে হবে না; বরং তারা সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে।

---

[২৪] সূরা আলে ইমরান : ১৪৫

[২৫] সূরা আস শুরা : ২০

[২৬] সূরা নিসা : ৭৯